প্রবন্ধ ১

অধুনা প্রোমোটার ভরসা

জহর সরকার

১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৬, ০০:০০:২৮

একমাত্র বাঙালিই বিশ্বকর্মার পুজো করে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের একটি নির্দিষ্ট ধরাবাঁধা তারিখে— ১৭ সেপ্টেম্বর। এটা একটু আশ্চর্যের। উত্তর ও পশ্চিম ভারতে শিল্পী, কারিগর ও শ্রমিকরা তাঁদের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির পুজো করেন দেওয়ালির পরের দিন, গোবর্ধন পুজোর দিনে। দক্ষিণ ভারতে আবার যন্ত্রের আরাধনা হয় সরস্বতী পুজোর সঙ্গে, ওঁরা বলেন আয়ুধপূজন, যেটি অবধারিত ভাবে পড়ে আমাদের মহানবমীর দিনে। আমাদের চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী বিশ্বকর্মার পুজো হওয়ার কথা চান্দ্র মাস ও তিথি অনুসারে, ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষে। কিন্তু বাঙালি এই একটা পুজোর জন্যে চাঁদের বদলে সূর্যকে মেনে ইংরেজি ক্যালেন্ডারের নির্দিষ্ট দিন ধরে রেখেছে।

শুধু এই কারণেই যে বাঙালি আলাদা, তা নয়। সারা ভারতের লক্ষ লক্ষ মানুষ পৌষ সংক্রান্তিতে ঘুড়ি ওড়ায়, ওই দিনে ভারত জুড়ে কত ঘুড়ি ওড়ানোর প্রতিযোগিতা হয়, কিন্তু বাঙালির ঘুড়ি ওড়াবার মাহেন্দ্রক্ষণ হল এই বিশ্বকর্মা পুজোর দিনটা। মধ্য-জানুয়ারির যে ঠান্ডা হাওয়ায় সারা ভারত ঘুড়ি ওড়াতে ভালবাসে, বাঙালি হয়তো সেই হাড়কাঁপানো অভিজ্ঞতা এড়াতেই ওই সময় ঘুড়ি-লাটাই নিয়ে ছাদে ওঠে না। আসলে বাঙালির ছেলেমেয়েরা ২০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নীচে তাপমাত্রা নামলেই গলায় মাথায় কানে বেশ করে মাফলার জড়াবার আদেশ পেয়ে বড় হয়েছে কিনা! কিংবা, বাঙালি হয়তো সব কিছুতেই অন্যদের থেকে আলাদা হতে ভালবাসে। সে রাজনীতিই হোক আর ঘুড়ি ওড়ানোই হোক। কিন্তু, প্রশ্ন হল, বিশ্বকর্মা পুজোর জন্য বাঙালি এই দিনটাই কেন বেছে নিল?

বেশির ভাগ হিন্দুর স্বভাব হল, যে কোনও ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁরা বৈদিক যুগের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন, যে কোনও উৎসব বা পুজোর ব্যাপারে বেদ থেকে কোনও একটা উল্লেখ খুঁজে বার করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে উৎসবটি নির্ঘাত বৈদিক যুগে শুরু হয়েছে এবং সেই থেকে হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসছে। সরস্বতী পুজোর ক্ষেত্রে আমরাও এই ভুলটা করেছি। বেদ-প্রেমী হিন্দুদের মতোই আমরা ধরে নিয়েছি, বৈদিক যুগের এই দেবীর পুজো বহু প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত। যদি তা-ই হত, তা হলে ভারতে দেবী সরস্বতীর বহু মন্দির থাকত এবং ইতিহাসে তার প্রামাণ্য তথ্য মিলত। ঘটনা হল, বাংলায় ঘটা করে সরস্বতী পুজোর চল শুরু হয় স্কুল-শিক্ষার প্রসারের পরিণামে, উনিশ শতকের শেষ দিকে। আমার মতে, বাংলায় বিশ্বকর্মা পুজোও আধুনিক, উত্তর-ঔপনিবেশিক একটি ধারা। প্রমাণগুলো খতিয়ে দেখা যেতে পারে।

প্রথমেই যদি বিশ্বকর্মার মূর্তিটি বিশ্লেষণ করি, তা হলে দেখব, বিভিন্ন জায়গায় ও বিভিন্ন সময়ে সেটি বিভিন্ন রূপে আমাদের সামনে এসেছে। ঋগ্বেদে তাঁকে কল্পনা করা হয়েছে ব্রহ্মার অনুরূপ মূর্তিতে, যাঁর সাদা লম্বা দাড়ি আছে। বৈদিক আর্যদের তো কোনও মন্দির বা মণ্ডপ ছিল না, কারণ তাঁরা মানুষের তৈরি কোনও দেবদেবীর মূর্তি পুজো করতেন না, তাই সেই সময়কার বিশ্বকর্মা-রূপ ঠিক কেমন, তা অনুমান করা সম্ভব নয়। তবে পরের দিকে এই দেবতার প্রতিকৃতিতে কোথাও একটি মাথা, কোথাও তিনটি, কোথাও বা তিনি চতুর্মুখ। বলা হয়, বিভিন্ন কোণ থেকে তাঁর সমস্ত সৃষ্টিকে দেখার জন্য বিশ্বকর্মার অনেকগুলো মাথা দরকার। তিনি চতুর্ভুজ, কখনও বা হাতের সংখ্যা চারের বেশি। বেদ তাঁর বর্ণনায় বলেছে, 'আমাদের স্রষ্টা, আমাদের পিতা, যিনি সমস্ত স্থান এবং সব প্রাণীকে জানেন। তিনিই এই ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা।' বিশ্বকর্মার বাহন পাঁচটি সাদা হাতি, যদিও কোনও কোনও মূর্তিতে একটি কালো হাতিও দেখা গিয়েছে। অনেক সময় দেখা গিয়েছে প্রাচীন দাড়িওয়ালা বিশ্বকর্মা একটি সিংহাসনে আসীন, একটি পা অন্য ঊরুর ওপর তোলা, পায়ের কাছে একটি রাজহাঁস। কিন্তু এই দেবতাটি যত দিনে আধুনিক বাংলায় আবির্ভূত, তত দিনে তিনি দাড়ি কামানো সুপুরুষ। ঠোঁটের ওপর সরু গোঁফের রেখা, ঠিক যেন কার্তিক ঠাকুর। বাহন — একটি মাত্র কালো হাতি।

ঠিক এক শতাব্দী আগে ভারতীয় উৎসবের মনোযোগী ব্রিটিশ পর্যবেক্ষক এম এম ডানহিল লিখেছিলেন, 'বিশ্বকর্মাকে একটি ঘটে পুজো করা হয় এবং ঘটের সামনে যন্ত্রপাতি রাখা হয়।' আধুনিক বাংলায় বিশ্বকর্মার পুজো শুরুর বিষয়ে কোনও প্রামাণ্য তথ্য আমাদের কাছে নেই। উইলসন, উইলকিন্স, ক্রুক এবং মার্ডক-এর লেখায় বিশ্বকর্মা পুজোর উল্লেখ পাই না, অথচ তাঁদের লেখায় ঘেঁটু, শীতলা, ষষ্ঠীর মতো ছোট ছোট দেবীর কথাও রয়েছে। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, এ কালের বিশ্বকর্মা পুজো শুরু হয়েছিল এই অঞ্চলে নানা রকম কারখানা তৈরির পর।

তবে, খ্রিস্টীয় তৃতীয় বা চতুর্থ শতকে লিখিত মহাভারতে বিশ্বকর্মার উল্লেখ মেলে। সেখানে তিনি 'শিল্পের দেবতা, হাজার হাজার কারুকাজের স্রষ্টা, দেবতাদের ছুতোর, দক্ষ কারিগর, এবং সমস্ত রকম গয়নার রূপকার।' এবং সেই জন্যই তিনি পাঁচটি বড় পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষজনের আরাধ্য: ছুতোর, কামার, স্বর্ণকার, ধাতুশিল্পী, রাজমিস্ত্রি। ড্রাইভার, ইলেকট্রিশিয়ান, মেকানিক, কারখানার শ্রমিকদের মতো শিল্পবিপ্লব-উত্তর পেশার সঙ্গে যুক্ত যাঁরা, তাঁদের এক জন নব্য দেবতা আমদানি করা ছাড়া আর উপায় ছিল না।

ঋগ্বেদের দুই সহস্রাব্দ পরে যে স্থায়ী সমাজের ভিত্তিতে মহাভারত এই চূড়ান্ত রূপটি পায়, তাতে তাঁর ভূমিকা পরিষ্কার ভাবে বর্ণিত ছিল। বেদে বিশ্বামিত্র এবং ত্বষ্টা, এই দুই দেবতার ধারণা নিয়ে যে বিভ্রান্তি আছে, মহাভারত সেই বিভ্রান্তি দূর করে। অন্য দিকে, ইন্দো-ইউরোপীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী, প্রাচীন গ্রিক দেবতা জিউস-এর পুত্র হিফিস্টাস, যিনি গ্রিক পুরাণ অনুযায়ী কারিগরদের দেবতা, তাঁর সঙ্গে বেদে উল্লিখিত বিশ্বামিত্রের মিল রয়েছে। আবার বিশ্বামিত্রের সঙ্গে অগ্নি ও কারিগরির প্রাচীন রোমান দেবতা ভালকান-এর ও মিল রয়েছে, যাঁর নাম থেকে আমরা পরবর্তী কালে 'ভালকানাইজড' শব্দটি পাই, যার অর্থ হল কোনও একটি বা অনেকগুলি বস্তুকে উষ্চ তাপে রূপান্তরিত করে একটি নতুন বস্তু তৈরি করা। যেমন, রবার।

রামায়ণ ও মহাভারতের পরবর্তী নানা পুরাণে বিশ্বকর্মার অপূর্ব-নির্মাণশক্তিসম্পন্ন প্রজ্ঞার বর্ণনা রয়েছে— সত্য যুগে তাঁর অলৌকিক কীর্তি স্বর্গলোক, ত্রেতায় তিনি রাক্ষসরাজ রাবণের জন্য স্বর্ণলঙ্কা তৈরি করেছিলেন। দ্বাপরে বিশ্বকর্মা গড়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী দ্বারকা। এবং খাণ্ডবপ্রস্থকে তিনি পাণ্ডবদের মোহময় ইন্দ্রপ্রস্থে রূপান্তরিত করেছিলেন। সে মায়া এতটাই নিখুঁত ছিল যে, দুর্যোধন ভুলবশত একটি জলাশয়ে পড়ে যান। তার পর তো দ্রৌপদীর সেই উপহাস: অন্ধের পুত্রও অন্ধ। পরের ভয়ানক ইতিহাস আমাদের জানা। আর তাই বাংলার নব্য বিশ্বকর্মা এখন নির্মাণশক্তির দায়দায়িত্ব প্রোমোটারদের হাতে ছেড়ে দিয়ে ক্ষুদ্র মানুষদের দ্বারা পূজিত হয়ে বেশ তুষ্ট।

প্রসার ভারতী-র সিইও। মতামত ব্যক্তিগত